সূচীপত্র

দুই

উৎসর্গ

ডাক্তার কালীপদ মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শ্রী হৃষীকেশ ঘোষ, শ্রী পীযূষকুমার বসু,

শ্রী মাধব দে, শ্রী সুধী দে, শ্রী কনকেন্দ্রনাথ মিত্র,

শ্রী রজতেন্দ্রনাথ মিত্র, ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

স্নেহাস্পদেষু

কারণ, জেনেছি

কারণ, জেনেছি পাই যে আঘাত সেও তুস্থ সভ্যতাবশত।

সহজে কোথায় মুক্তি, মানবজগতে কেন কোনও জগতেই?
উদ্ভিদে পশুতে শূন্যে ফাঁকিটা কাটাতে পারো বটে,
কিন্তু ধনী বা গরিব ছুটি বেজায় নশ্বর হায়! এবং বাধ্যত।

শান্তি চাই, তাই জটাজুটে মুক্তি নেই, তাছাড়া সকলে
হত্যা সেরে হিমালয়ে যদি মজে অর্ধনগ্ন মগ্নতার ছলে
তাহলে কি শান্তি পাবে এদেশ ওদেশ, ব্যক্তিতে সমাজে?
কিংবা আন্তরিক স্বপ্নসাধ পাবে বস্তুসত্তা গাজনে ব্রতেই?

সহজের স্বস্তি নেই, সভ্য হৃদয়ের এই উভয়-সংকটে,
সেখানে স্বপ্নও কাচ বস্তুতই, পাশ ফিরলেই ভাঙে।

সভ্যতা কঠিন প্রভু, দেখ তার রূপায়িত প্রভাবের ফাঁস;
উভয় দিকেই তার গেরো। বহুধাবিস্তৃত অসম্পূর্ণে সম্পূর্ণকে দেখে

—যেমন সূর্যাস্তে দেখি গত আর পরদিনের সূর্যোদয় রাঙে,
সেই যেমন কয়েকজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি গিয়েছেন লিখে ব'লে এঁকে—

শান্তির কর্মিষ্ঠ রূপে শুদ্ধিতে সভ্যতা গ'ড়ে স্বপ্নে অস্থিতে মজ্জায়
অসুস্থের বা তুস্থের জিজীবিষা বেঁচে যায়, প্রায় স্বয়ংপ্রকাশ
অস্তিত্বের খোদাই অক্ষরে সভ্যতার স্বপ্নময় পূর্বলেখে
চেতনের-অবচেতনের ইন্দ্রধনু প্রজ্ঞা গ'ড়ে। আর গালবাদ্য বাজে
তখন কৈলাসে নৃত্যে। সভ্যতার কালদূত শত্রু ক'টা পালায় লজ্জায়

নিজেই অবাক হয়

নিজেই অবাক হয়, স্বভাবের এ কী স্বাধীনতা !
হৃদয়ে রৌদ্রকে ধরে, বীজকম্প আকাশে বাদল !

যতই আঘাত পায়, কিছুতেই মানে না হীনতা,
মনের পাতালে তার আদিতেই মাটির দীনতা
রূপান্তর পেয়েছিল অঙ্গারিত হীরকে উজ্জ্বল।

আশা হতাশার উৎসে যদি বোমা জ্বালে রসাতল
তখনই সে গান শোনে মুরজ মুরলী তূর্যে,
ফেরারী হতেই হলে জঙ্গলেও বাজায় মাদল !

গোপনে অবাক হয় নিজেই সে, তৃণের ক্ষীণতা
কোথা পায় শিরস্ত্রাণ ? মাটিতে, হাওয়ায়, সূর্যে ?
সেখানে কি গড়েছে সে বাষ্পে বাষ্পে তার স্বাধীনতা

নিশ্বাস-প্রশ্বাসে শান্ত হর্ষে

আশ্চর্য মুহূর্তে গৈবী আলো-অন্ধকারে ঘুম !

ধীরে ধীরে জেগে-ওঠা।
তখনও নিঃঝুম বিশ্বময় জীবজন্তু।
তারপরে জেগে ওঠে নানা রঙে পাখি
হরেক আওয়াজ নানা সুরে নানাবিধ স্বরে।

তারপরে দেখি নানা আলোকিত বেশে
নানান রকম কিন্তু তবু সুরে স্বরে স্থির।

আর প্রথমেই প্রতিবেশী মোরগরাজের ডাক।

তারপরে চন্দনার স্রোতে চতুর্দিকে
আর বন থেকে নানা টিলা থেকে
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন্ত তিতির শাল আর মহুয়ায়
কখনও বা বনের ময়ূর।

গৈরিক স্রোতের বাঁকে লাল জলধারা,
নানাবিধ কৃষ্ণ বা ধূসর শিলা আর বালি
ভাস্কর্যে তরল জলে ও স্ফটিক আলোকে,
নীলিম আকাশ ঊর্ধ্বে।

শরতের স্নিগ্ধ এই আলোছায়া নয়নাভিরাম !
উন্মুখর জলের কল্লোলে চলে অবিরাম—
পেশীতে ও চোখে স্পর্শে নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
প্রকৃতির শান্ত হর্ষে॥

শত মেঘ সব ছন্নছাড়াই ওড়ে

হরেক বর্ণে শত মেঘ সব ছন্নছাড়াই ওড়ে—
কখন যে হবে একচ্ছত্র মৈত্রী ও শক্তিতে !

এক ডোরে যেন ছিন্ন মেঘেরা এদিকে ওদিকে ঘোরে,
বলে : আহা যদি পারি বা বাঁধতে হৃদয়ের চুক্তিতে
—তাহলে কি হত শান্তি ? শান্তি এবং সমুচ্ছ্বাস ?
কারণ ? শান্তি শমনেরই উল্লাস।

স্থানীয় সমাজে নেই, আছি শুধু প্রকৃতির এই বাহারে—
স্বচ্ছ নীল ও শ্যামল শষ্পে, খরা মাটিতে ছড়ানো পাহাড়ে,
নানান ধরনে গড়নে এবং শক্তিতে বর্ণালিতে।

দিকে দিকে এই নীলিম আকাশে, মেঘে মেঘে চিত্রালিতে
মাটিতে মাটিতে চাষের নানান কাজের আলে ও নালিতে
আকাশের নানা রূপে প্রায়শই গ্রামীণ টিলার পাড়ে

আজও অবশ্য ট্র্যাক্টর আদি যন্ত্র সেই অঞ্চলে,
তবু ভাবা যায় কাল হবে চাষ একালে যন্ত্র কৌশলে ॥

তাও কি হয়

রাতের ভোর নেই, তাও কি হয় ?
রাহুর গ্রাস কবে আমরণ ?
অথচ তাই শুনি জীবনময়,
অসহ তাই দেখি প্রতিটি দিন ।
মরণ যদি সাজে অন্তহীন,
নানান ভোলে নানা আভরণ
নিলাজ পরে রোজ বিশ্বময়,

তাহলে, আর কবে, কবি, তোমার
বিভাসে ভ'রে দেবে পূরবীকে,
গাইবে রাঙা আলো পাহাড়পার
সাগরে রঙ হেনে শত দিকে
ঘুম ও জাগা এঁকে প্রতিটি দিন ?
বাংলা শ্রাবণের শূন্য তন্ময়
উদয়-অস্তের একই সে-কবিকে

একই সে-জিজ্ঞাসা বারংবার,
প্রভাতে সন্ধ্যায় বিশ্বময়
একই সে-জিজ্ঞাসা—বা হাহাকার।

বিশ্রামেও ক্ষিপ্র গতি

কারো সে-সুযোগ আছে, কারো কারো নেই।
ভাঙা বাড়ি, জানলা দরজা ঢিলা,
ছাদ থেকে জল পড়ে, বালি ঝরে,
রৌদ্রের অজেয় গতি, চলে চতুর্দিকে,
আর ঝোড়ো বৃষ্টিজল ভাসে ঘরে।

হাওয়া দেয়, নিশ্বাস হাওয়ায় ভরে,
গাছে গাছে বেগ জাগে, আমারও শরীর মন চতুর্দিকে,
পথে পথে দেখি খেত, আকাশ, খালের মাঠ, টিলা,
বিশ্রামেও ক্ষিপ্র গতি চৈতন্যে, যা সকলের নেই,
যাদের দস্তুর অন্য দম-বন্ধ ঘরে।

তাই জনসাধারণ্যে হয়েছি নন্দিত চ'ষে গ'ড়ে এঁকে লিখে
দুর্ভাগ্যে সৌভাগ্য আছে, অনেকের ছলে-বলে নেই॥

দিনকে রাত্রির নীলে

তবুও রাত্রিতে শোনা যায়।

নাকি ঐ ক্ষীণ সুর বহুদূর নক্ষত্রসংগীত মাত্র ?
স্বপ্নের বেয়ালা বুঝি বেজে চলে মহাশূন্যতায়
শুনি যে তা মনে হয় শুধু বুনি স্বপ্নময়
নীলে, মহাশূন্যতায়, ছাদে ছাদে খোলা জানালায়।

কারণ উদগ্র দিনে গ্লানির জ্বালায়
সে-গীতবিতান অশ্রুত সংগীত প্রায়,
কোমলগান্ধারে যা শোনা উচিত ছিল
কানাড়ার পাকে-পাকে, কিংবা এ-মাইনরের
হাইলিগে দাঙ্কেসাঙ্গে, অহোরাত্র
বিংশ শতাব্দীর প্রজ্ঞাপারমিতার বিজ্ঞানে
প্রতিশ্রুত সমবেত পরিপূর্ণতায়।

নক্ষত্রধ্বনিত কম্প্র অন্ধকারে ডুবে যায় গৃধ্নুরও কারবার।
তাই রাত্রিকে হৃদয়ে বাঁধি
চৈতন্যের মহাবিশ্ব নীলে,
নাক্ষত্রিক নীলে,
যদি মর্ত্য মৃত্তিকায় কর্দমাক্ত রাজপথে দৈনিক বিপথে
দুর্দশায় ব্যাপ্ত হয় আমাদেরই তরঙ্গিত ছন্দে মিলে
সুরে-সুরে মানবিক জীবনের প্রাকৃত প্রতিষ্ঠ এক পরম সংগীত,
কলকাতারও স্তব্ধতায় শুদ্ধ উজ্জীবিত
যে-সংগীতে উদ্দেশ্যের পূর্ণতায়
সমাহিত হয়ে যায় সর্ববিধ আধি,

ফাঁকে-ফাঁকে নিমগাছের শিহরনে যে-সংগীত

রাত্রির চৈতন্যে দেখা যায়

দিনকে রাত্রির নীলে অবিচ্ছিন্ন বাঁধি বারবার

দীর্ঘায়ু নিষ্ঠায় ॥

তোমার অশ্রুর প্রান্তে

তোমার অশ্রুর প্রান্তে হাসে
মহাসমুদ্রের নীলে শান্ত তটরেখা,
ঘরপোড়া মানুষের ঝড়ে-ভাঙা জাহাজের অন্তরীণ নিশ্চিত আশ্রয়।
তোমার চোখের ক্ষান্ত রাত্রির আকাশে
দূর সূর্য থেকে দেখা পল্লবিত বনরাজিনীলা
জীবনের হেমন্তে তন্ময়।

তোমার চোখের উচ্চে প্রখর কৈলাসে—
বহুদিন ছিল এক সাধ
বিশ্বজ্বালা বিরাট হিমের যজ্ঞে
পেতে রাখি সমস্ত হৃদয়
অগ্নিময় শতদলে,
তোমার বিস্মিত পক্ষ্মে, চোখের মণিতে
যেখানে দাহই শান্তি, অতনু আকাশে
নিত্যের যেখানে মুহূর্তের মরণেই জয়।

তুমি দিলে হাতে তুলে দানের আপন লাস্যে
সেই পারিজাত,
তোমার সন্ত্রস্ত ধ্যানে একদা যে-ফুলে
তোমাকে অভয় হেনে তুষারবিদারী হাস্যে
দেবদারু বনে চ'লে গেল ক্ষিপ্র পার্বত্য কিরাত।
আবার তোমাকে সেই ফুল দিই,
একঝাঁক অরণ্যের অন্ধকার বাঁধো,
কবরীচূড়ায় বাঁধো পারিজাত, স্মিতহাস্যে বক্ষে বক্ষে তুলে।

বহুদিন মনে ছিল সাধ,
রাত্রিগুলি খুলে দিই অপার অগাধ

তরঙ্গিত নীলে নীলে, বিশ্বময় সমস্ত জাহাজ
স্বাধীন স্বপ্নের মতো অন্ধকারে স্বচ্ছন্দ, অবাধ
আর, দিনগুলি সূর্যোদয়ে মেলাই বন্দরে,
শান্ত স্থির স্তব্ধ তটদেশে উদ্যানছায়ায়
মাল্লাদের প্রতীক্ষিত ঘরে।
তোমার দু'বাহু ঘিরে মনে হয় আজ
পূর্ণ হবে সাধ॥

দেহকে সাধে মনে

প্রেমেরই জানা যুগলে বাঁধা মন,
আমরা শুধু চিনতে পারি শরীর।
মন দিয়ে কে করে আলিঙ্গন ?
অতনু কবে ছবি আঁকল রতির ?
হে প্রেম ! বলো মনের কথাটাই
বলো হে এর হৃদয়ে ওর কানে।

প্রেমেরই জানা স্নায়ুর কাঁটাবনে
কোথায় কে যে চিরঝুলন বাঁধে।
আমরা বৃথা শমীশাখায় খাটাই
শরীর-মন মরণসন্ধানে,
কারণ প্রেমে জীবন পায়ে সাধে
মৃত্যুকেই, দেহকে সাধে মনে॥

যেমন সংগীত পায়

তাদের চুম্বনে তারা স্পষ্টতই খোঁজে চিরন্তন।
পায়ও, যেমন সংগীত পায়, অবশ্য প্রহর তরে।
আপাত-পূর্ণের ঢেউয়ে আশ্লেষের বেলাভূমি ভরে,
সে তীব্র পূর্ণতা যদি ক্ষান্তি মানে, শান্ত হয় অনন্ত চুম্বন

দ্বৈতের বা দ্বান্দ্বিকের সমন্বয়ে আর ক্রমান্বয়ে
বুঝি এই কম্বুগ্রীবা প্রেমেরও প্রগতি !
ভিক্ষায় সন্নত কে বা ? কে বা পাবে সাষ্টাঙ্গ সংগতি
ক্ষয়িষ্ণু দৈনিকপত্রে চিরায়ুষ্মতীর অব্যয়ে।

অনিত্যের ত্রিসীমায় আনন্দের ব্যাপ্ত আলিঙ্গন,
তখনই মানবসত্তা জীবনের সম্পূর্ণ প্রণতি ॥

দ্বৈতে প্রেম

নিসর্গের উচ্চাবচ সংহতিতরঙ্গে
যে-গতির আয়তি
প্রহরে প্রহরে আর নিত্য নবরঙ্গে,
একাকার প্রকৃতির প্রণতি,
যে-নন্দনে আরতি—

হরগৌরী মূর্তি পায় প্রাণময়
সেই নটরাজের আভঙ্গে।
মানবিক দৈনিক জীবনযাত্রা
খুঁজে পায় নিজের ব্যূহও
—অনেকাংশে তারই সৃষ্টিকর্ম—।

আর মাঝে মাঝে হয়তো বা ধসায়
শিখর— আর গুহাও—
তখনই তো পূর্ণিমার বৃত্ত
গড়ে, আঁকে, প্রাণ দেয়—
দ্বৈতে প্রেম এক ধর্ম ॥

তোমায় নতুন ক'রে পাবো ব'লে

সর্বাঙ্গীণ শুভদিন প্রতিদিন, শ্রাবণ-আশ্বিন
অঘ্রান-ফাল্গুন আর আষাঢ়-ভাদ্রের
জলে স্থলে থৈথৈ কিংবা রৌদ্রে নীল তলোয়ার,
শিশিরে ঘনিষ্ঠ মৃদু উল্লসিত বসন্তবাহার
বানডাকা পাড়তোলা মেঘে রৌদ্রে মাটির আর্দ্রের
মিলনের সূর্যস্পন্দে জীবনের সৃষ্টিময় দিন।

তুমিই এনেছ দৈবতা এ-জীবনে তোমার আমার
দেহে মনে এ-জীবনে দয়িতা যে নিত্যের পূর্ণতা
তার ফুল দিই আজ চোখে চোখে মানসগভীরে,
আজ তাই প্রতিদিন প্রেমের পাত্রের হিরণ্য শূন্যতা
ভ'রে দিক অভ্যাসের জয়ে, এবং আমরাও ফিরে ফিরে
পাত্রের শূন্যতা ভরি জীবনের স্বরচিত পূর্ণে বারবার॥

শরীরে এক উষা

মন তখনও অস্তমিত, শরীরে এক উষা
জাগিয়ে তোলে মননকেও, চোখে আর কানকেও,
স্তব্ধ জাগা, রাতের গায়ে আলোর মৃদু ভূষা,
মনে হয় যে সাজায় যেন এ-প্রান্তে, ও-প্রান্তেও
মনকে যেন গোছায় স্মিত স্বয়ন্তর শান্তি।

একাত্মের এই জগতে পর অথবা সুদূর
সান্নিধ্যে আপন সুখে হাসে চোখের কাছে।
এখন ক্রূর সমস্যাও ক্লান্তিকর নয়,
কেননা নিজে বিলিয়ে শত সহস্রেই বাঁচে,
মিলিয়ে যায় বিতৃষ্ণা আর ক্লান্তি আর ভয়।

তখন বাজে স্নায়ুতে এক প্রভাতফেরী সুর,
জাগায় সারা শরীর-মনে বরাভয়ের ক্রান্তি ॥

আমার হৃদয়ে বাঁচো মননে স্নায়ুতে

চিরসুন্দরের দূতী,
আপন প্রাঙ্গণে এলে অসতর্ক আবির্ভাবে,
আমার চোখের হীরা
হৃদয়ের মর্মস্থলে জ্বলে তাই যেন সাক্ষাৎ প্রস্তাবে
মূর্তি ধরে, মৃদঙ্গ মন্দিরা
বাজাও অজ্ঞাতে নিজে আমারই আকৃতি।
তুমি তো জানো না তুমি আজীবন সুদীর্ঘ আয়ুতে
আমার হৃদয়ে বাঁচো মননে স্নায়ুতে
আনন্দের নিত্যনৈমিত্তিক আমারও প্রস্তুতি ॥

পেরিফেরাল্

হৃদয় ? মোর হৃদয়ে নাহি জানি।
হৃদয়ে জেনে কি হবে বলো ভাই ?
হৃদয়ে মোর পশিতে ভয় মানি ।
হৃদয় ? মোর হৃদয়ে নাহি জানি—
কে জানে ! যদি জানলে তার বাণী
হাসতে গিয়ে মৌন হয়ে যাই ?
হৃদয় ? মোর হৃদয়ে নাহি জানি।
হৃদয়ে জেনে কি হবে বলো ভাই !

কেন তুমি ভাবো

কেন তুমি ভাবো, এ-আকৃতি শুধু যৌন ?
অংশত তাই, আবার মাধুরী মমতাও জেনো সত্য।
কেন তুমি খোঁজো কোনটা মুখ্য গৌণ ?
তা কি খুঁজে পাবে ? প্রেম জেনো অবিভক্ত।

চৈতন্যের বিশ্বেই বাঁচে প্রণয়,
যেন সহজিয়া গান আমাদের দোতারায়।
তাই তো তোমার সঙ্গে একাত্মতায়
গান হয়ে ওঠে আত্মদানের প্রলয়।

আমার ঈপ্সা সদাজাগ্রত, হে চিরপ্রৌঢ়া তন্বী !
তাই আদিকাল থেকে আছি অনুরক্ত।
তুমিই বাহুতে দেহে দেহাতীত বহ্নি
তুমি সত্তায় সূর্যে পূর্ণ সত্য॥

বিদায় সর্বদা

বিদায়ের লগ্ন জেনো সর্বদাই,
গতাসুর পায়ে কেন লাজাঞ্জলি দাও ?
কানে যার কৃষ্ণপক্ষ রথের উধাও
চক্রের আসন্ন ধ্বনি, যেদিকে পালাই আকণ্ঠ ধুলায়,
তাকে কেন মাল্যদান ?

নাকি ঠিক সেই হেতু ?
কারণ সময় যার ঊর্ধ্বশ্বাস, সূর্যাস্ত নিঃশেষ,
যে মাত্র অস্তিত্ব আর নাস্তিক্যের সেতু ;
তারই চোখে, চাও, জ্বলে সাত্ত্বিক আবেশ,
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে রাসে শুদ্ধছন্দ যমুনার গান ?

অথচ বিদায় কে বা দেবে

অথচ বিদায় কে বা দেবে ?
কাকে ? কবে ?
জীবনের এ মিশ্র উৎসবে ?
দীর্ঘায়িত বহ্নি-শিখা ! তুমি তো তা জানো,
—তোমরাই জানো।

আমরা যে মানুষ মাত্র !
কেউ নই দেবতা বা দানো।
অথচ কে হবে বলো এ বাস্তবে
সর্বদা নিশ্চয় ?

সর্বদা কি ?
সুতরাং চিন্তা বা দুশ্চিন্তা— বুঝি একই নয়-ছয় ?
তাই বুঝি মানব পুত্রেরা আর কন্যারাও বাঁচে,
যাচে শান্তিজল আর মনন সদাই,
ঘৃণা আর গ্লানিতেও,
আপন গৌরবে ?

চতুর্দশপদী

তবু জলে ফলে ভালো, না হলেই তীক্ষ্ণ হাহাকার।
মাটিও পরান্নে ক্লান্ত, হতমান, জরিষ্ণু, নিঃসার,
প্রাচীন লাঙল দীর্ণ, শীর্ণ দুটো বলদ সম্বল।
সর্বদা আকাশে মুখ নিষ্পলক, চায় শান্তি, জল।

জন্মমৃত্যু কাটে আশা-হতাশায়, সত্তা তেপান্তর,
যেন বীরভূমির কোনও মল্লদেশে জমির প্রান্তিকে
ঐশ্বর্যে উষর মাটি, অবহেলা যার চতুর্দিকে,
নদীনালা মৃতপ্রায় সর্পাহত, বক্তৃতাও শূন্যে আড়ম্বর।

অবান্তর গৌণতায় জ্বলে চেতনার কর্মাটাঁড়,
কিংবা নামে ভুল বৃষ্টি, শোথে মরে আসন্ন ফলন,
অনাহারে কিংবা অতিসারে দুস্থ ভারতীয় চলনবলন।
অঘ্রানের লাল উষা সূর্যাস্তেই শয্যাগত জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়

হৃদয়েরা তবু ভিজা পথ হেঁটে, আশা বা নিরাশা
পায়ে চেপে, পেতে চায় ফলন্ত জ্ঞানের নিজভাষা॥

জীবনে জীবন ঢালে স্রোতে

বহুদূর এসেছি যে ! বিভিন্ন বয়সে
মনে মনে ভাবি যে মান্ধাতা !
অথচ একালে কিন্তু কোথা
সেই আদি পিতামাতা ?

এ তো বড় রঙ্গ জাদু
নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি !
অথচ এখনও আছে
নানা মিত্র নানা সঙ্গী !
এখনও যে মনে হয়
যতদিন যায় বাঁচা
শরীরের তুস্থ খাঁচা
এখনও যে মহাশয় !
মৃত্যুর সুদূর স্রোতে
ডুবব না ভাবি সদা ।

অন্তত আপাতত
আয়ু যত বাড়ে তাতে—
এই তো মানব-মন
জীবনে জীবন ঢালে স্রোতে ।।

আকাশবিহারী

এ ভরা বাদর মাহ ভাদরে—
হে আকাশ, কেন না আষাঢ়ে বা শ্রাবণে ?
মানুষ যে চাতকের মতো ঊর্ধ্বমুখ,
চোখ-কান আকাশবিহারী, রৌদ্রে বাঁধা দুঃখ-সুখ !

জল দাও, হে আকাশ,— অন্ন যে জোটে না—
অন্ন বিনা বাঁচাই যে দায়—
এদেশে জল কিনে অসম সে মূল্যে
চাষী পরের ও নিজেরই অন্ন কেমনে জোগায় ?

যামিনী রায়ের ভাষাতেই— সবচেয়ে বীরত্বের কাজ,
আমাদের চাষীরই চাষ— বিদেশী লেখক
সমরসেট মমৃও যে-কথা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন—
সময়ের জল— হে আকাশ, তুমি দাও আমাদের !

এখন যা দিলে এইদিকে—
অন্যদিকে বন্যা দিয়ে সেই কি ভুললে ?

আশ্চর্য প্রশস্ত পথ

আশ্চর্য প্রশস্ত পথ, নিসর্গে উদার,
কংক্রিটে, কোথাও বা ম্যাকাডামে পাকা।
আশেপাশে, দূরে বা কাছেই, পোড়ো-পোড়ো গ্রাম
দীনহীন, কোনোটা বা ফাঁকা
(অতীতে বা ভবিষ্যতে হতেও তো পারে বটে আরেক চেহারা ?)

মানুষ অনেকে শহরের কলে মিলে কিংবা গেরস্তবাড়িতে
স্বপ্ন দেখে দারোয়ান অথবা বেয়ারা।
যারা আছে তারাও স্বাধীন নয়, আছে নেহাৎ নাড়িতে
দীর্ঘজীবী দেশজ স্পন্দন, তাই।
অথচ স্বাধীন নয়, হীনমন্য দীন।

আশ্চর্য সুন্দর রাস্তা, যেন ডাকে একটি সংলাপে
সমস্ত শহরগ্রাম, প্রত্যেকেই সংলগ্ন অথচ স্বাধীন।
গাড়ি থামে। কফি নামে, জলযোগ কিঞ্চিৎ স্যাণ্ডউইচে
এবং আপেলে, মুক্ত দৃশ্যে। ধোঁয়া নেই, ধুলো যদি ওড়ে
তাও বিশুদ্ধ মাটির, মেঠো, ছুটি-কাটানোর উপযুক্ত।
দূরে দুটি গ্রামীণ বালক, আদুল শরীর,
জিজ্ঞাসায় স্থির, দেখে আমাদের আর
মধ্যে-মধ্যে পদচারণের ছন্দে দিগন্তে তাকায়
পাহাড়ের নীলে।

কি ভাবে তা সঠিক বুঝি না, কাছে গেলে
ভয় পায়, পিছনে ফিরায় মুখ, তারপরে ছোটে
আঁকাবাঁকা গ্রামের গলিতে, মাঠে, পাকা রাস্তা ফেলে॥

এরা সব তুস্থ গ্রাম

থেকে থেকে ছাট ঝরে ঝলকে ঝলকে,
বর্ষার সমৃদ্ধ রূপ— নাকি মৃত্তিকার রস।
কখন বা উদ্দাম সরসতা, কখনও বা শিথিল পলকে
সূর্যের হীরক-দ্যুতি।

কখনও বা ধানের আকূতি : জল! চায় জল!
মাটি যে শোষণ করে উলুপীর মৃত্তিকা গহ্বরে।
তাই চাষী ধান বোনে, ধান রোয়, কবে বা তুলবে ঘরে ঘরে!
পিপাসার্ত পরগনায় সকলে বিহ্বল।

অথচ তাদেরই মধ্যে মাঝে মাঝে মারামারি—
অনেকেই স্বয়ম-স্বার্থে, নিতান্তই মানবিক বটে!
লুটেপুটে চলেও না, কে বা জিতি-হারি!
পাড়ায় পাড়ায় তাই নানা কেচ্ছা রটে।

এরা সব তুস্থ গ্রাম! তার তবুও কত না
চলে খিটিমিটি! আবার সদ্ভাবও বটে!
মাঝে মাঝে শোনা যায় হরেক-ও রটনা—
শহরে যেমন, গ্রাম-গ্রামান্তরে তাই রটে।

অথচ ভালোও আছে বেশ কিছু কিছু সত্যই মানুষ,
কেউ কেউ শান্ত আর পরিশ্রমী তাতে,
আবার কেউ বা খালি জোচ্চুরিতে মারে আর মাতে—
তা সে মেয়েই হোক বা হোক না পুরুষ॥

শুনতে কি পাও

শুনতে কি পাও? শুনতে যে পাই, বলো।
অনেকেই? নাকি কেউ কেউ?—
এ-জীবন আজ হোক বরাভয়, ক্ষমা করো
ওগো ক্ষমা চাই ওগো জীবন!

হয়তো শান্তি দুর্লভ আর ইতরতাই
প্রায় দেখ জেতে, আছে দেখ কত ফেউ!
প্রায় দেখি হারে, মার খায় আর মারে।
তাই অনেকেই ধর্‌তাই বুলি ধরে!

এ-জীবন যেন দিল্লিওয়ালার যাত্রা
বুঝি কি বোঝো কি তার কিছু আজ বাইরে কিংবা ঘরে?

মাথামুণ্ডুর কি বা মাত্রা?
সবই কি তুচ্ছ? সবাই উচ্চ? কে বা আগে? কে বা পিছু?

আমাদের প্রতি দিনরাত্রিই মরণের ভোগে-ভয়ে।
অনাবৃষ্টি? অথবা প্লাবনে কোথায় কেমন জীবনে?
শুনতে কি পাই? তোমরাও শোনো প্লাবনে
জুলাই কিংবা শ্রাবণে?

তিনটি কবিতার সম্ভাবনায়

১

মনের ভিতরে বসানো সহজ,
স্বপ্নে আসন পেতে।
খড়ের চালায় রাখবে কোথায় ওকে?
বিদ্যায়তনে হয়েছিল দুটো কথা।
সে-কথাও ছেঁদো গাজনতলায়
এঁদো পুকুরের শীতে।
পাঁচ কথা জেনো বলবেই পাঁচ লোকে

২

রাঙা ফালি পথ ফ্যাকাশে সুদূর চাঁদের আলোয়;
ধুধু করে খালি মাঠ,
একা তালগাছ ভাবনা মাথায় শূন্যে তাকায়
এক চোখে ঢুলুঢুলু।
থেকে থেকে বুনো দমকা হাওয়ায় আঁচলে পানজাবিতে,
বাধায় হুলুস্থুলু ত্রিকালেশ্বর উচ্চকণ্ঠে হেঁকে॥

৩

তালের মাথা দোলায় ঘন পাতা;
শালের শাখা বাজায় করতালি,
খেজুরকাঁটা শূন্যে লড়াই করে,
হাজারখানেক বর্শাফলক ধরে,
পাগলা হাওয়ায় বাঁশঝাড়েরা নাচে,

আমলা-পাতায় হালকা নাচের নেশা।
একলা বোবা কলাবৌয়ের মাথাটা খালি দেখছি
শতচ্ছিন্ন বেশে॥

জ্বালাও আলো

আপু-টিপু জ্বালাও আলো !
চার লাইনের লেখাই ভালো—
মস্ত লেখায় চোখ বুজে যায়
জোনাক পোকার হাজার আলো-
তোমরা হাজার জোনাক জ্বালো

সমুদ্র সেই সমুদ্রেও

(জ্যুসেপ্‌পে উংগারেত্তি অবলম্বনে)

নেই আর মৃদু মর্মরিত নেই সেই গর্জমান সমুদ্র
সেই সমুদ্র

সব স্বপ্ন নিংড়ানো শুভ্রক্ষার প্রান্তর এ-সমুদ্র
সেই সমুদ্র

যেন দুঃখের আঘাতে স্ফীত সমুদ্র
সেই সমুদ্র

উদাসীন মেঘের পাঁতিতে দোল খায় সমুদ্র
সেই সমুদ্র

করুণ ধোঁয়ায় ওঠে শয্যা থেকে সমুদ্র
সেই সমুদ্র

মনে হয় ম'রে গেছে সমুদ্র
সেই সমুদ্র ॥

দুই

আজও মনে পড়ে সেই বরানগরের পাঠ আর গান

আজও মনে পড়ে, সেই বরানগর—
পাঠ আর গান, রবীন্দ্রনাথেরই এক নাট্যপাঠ !
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বললেন : চলো, ওঁর কাছে চলো।

বিরাট পুরুষ বিচিত্র সুন্দর তাঁর দৃষ্টি !
তিনি নাম শুনে বললেন : ও তুমি এসেছ !
—প্রণাম করলুম ! (আমাদের পরিবারের পুরুষদের মধ্যে
সচরাচর নিয়ম ছিল না।)
সেই চোখ মুখ আশ্চর্য সুন্দর !

অধ্যাপক মহলানবিশ বললেন : ওঁর কাছে বোসো।
নাটক পড়বেন। গান করবেন অমিতা সেন— ডাকনাম খুকু।
গভীর তার গান !
রবীন্দ্রনাথ বললেন, স্নিগ্ধ স্নেহ-ভরা স্বর, হালকা রসিকতার সুরে—
তুই তো কালো মেয়ে ! লোকে কী বলবে ? আমার পাশে বসে ?
অমিতা, খুকু, সরল উত্তর দিলে, সহজ স্বরে :
তা তো বলবেই ! লোকে বলবে— চাঁদের পাশে কলঙ্ক !
পরেই, সেই মেয়ের আবেগ-ভরা কণ্ঠে শুনলুম—
ও চাঁদ, তোমায় দোলা দেবে কে ?— দেবে কে ?
কবে সে চলে গেছে, অলক্ষ্যে রেখে গেছে আনন্দ,
দখিন হাওয়ার পথিক হাওয়ার পথে :
সুন্দরী বধূকে সাজায় যতনে অলক্ষ্য প্রেমের অমূল্য হেমে !
স্বপন দিয়ে যায় আধেক ঘুম নয়ন চুমে !—
যে-গান বিলেতী রাউণ্ডের মতো ঘুরে ঘুরে আসে,
বারে বারে,
বাংলা গানের সুরে নতুন ধারা বয়ে আনে—

প্রাচীন সেই গানের মতো—
সামার ইস্ ইকুমেন্ ইন্— লুডে সিং কুকূ !

রবীন্দ্রনাথের মনে কি পড়েছিল সেই বিদেশিনীকে—
যে সুগভীর স্বরে তাঁকে ডেকেছিলো—'মাঈ রবিন এডেয়ার' ব'লে—?

যে ছিলো আমার স্বপনচারিণী, তারে বুঝিতে পারিনি।—
তবু সে গান গেয়ে যায়— ফিরে ফিরে ডাক দিয়ে যে যায়।
নয়ন তোমার ডাকুক তারে শ্রবণ রহুক পথের ধারে—
ভোরের আকাশ ভ'রে যে যায় এমন গানে গানে—

তবু সে ডেকে যায় গান গেয়ে যায়, একাত্ম স্বরে—
চিনিলে না আমারে কি, চিনিলে না। আহা !

বাঁকুড়ার দুইজন

হয়তো দেশে অকর্মণ্য কেউ বেশি বা কম
যেমন বিশ্বে কোথাও হিম— হাড় সিরসির করে,
কোথাও ঘেমো-আবহাওয়া বা কোথাও কড়া গরম।

কেউ বা অতি চালাক, কারো সরলতাই চরম,
কেউ বা করে ঘোর সংসার কষ্টে ঘুপ্‌সি ঘরে—
এই জীবনে জীবিকাতেই সত্য এক পরম।

অথচ চাই দিনরাত হোক হিম বা মৃদু গরম,
ঝরঝরে আর জীবনানুগ, হোক না বাইরে ঘরে,
এই জীবনে জীবিকাতেই সত্য আছে পরম।

যামিনী রায়ের শিল্পলোকে কিংবা প্রজ্ঞা-বরে
বাঁকুড়া জেলার যোগেশ রায়ের নব্বই-এ নেই ভ্রম।
দৃষ্টি ক্ষীণ হলেও তিনি একটি অনুচরে

মনের সূর্যসাধনাতে নিজের গ্রন্থঘরে
বিজ্ঞানে বা বেদজ্ঞানে পাণ্ডিত্যে পরম
আত্মপ্রচার নয়, শুধুই বিদ্যানিধির স্বরে
সদাই এই জীবনে তাঁর জ্ঞানসাধনা চরম॥

জ্যোতি ঠাকুর

অস্তমিত রবি তার শেষ বেলাকার রশ্মি ঢেলে দেয়
পশ্চিমাকাশ থেকে পুব দিগন্তে :
দিঘারিয়ার পশ্চিম সূর্য আলোকিত করে যেমন
পুবে ত্রিকূটের প্রতিটি চূড়া গুহা।
মানুষের শেষ দিনে মন চলে যায়
ছোটবেলাকার ছোট স্মৃতির মনের আনন্দে।

রাঁচীতে আমার সেজ-জ্যাঠাবাবুর বাড়িতে
বাবার সঙ্গে গিয়েছিলুম,
বয়স আমার হবে তেরো-চোদ্দ।
বাবা নিয়ে গেলেন, একদিন, মোরাবাদি পাহাড়ে—
যেখানে, বিপত্নীক, একা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকতেন।
বহু ভাষা জানতেন— পণ্ডিত লোক তিনি—
একা বসে লিখতেন,
অনুবাদ করতেন,
স্কেচ করতেন, ছবি আঁকতেন।
আপন মনে, নিঃসঙ্গ একাই থাকতেন।

বাবা প্রশ্ন করলেন,
—চিনতে পারছেন ?
রোগা লম্বা ফর্সা সুদর্শন পুরুষ জ্যোতি ঠাকুর
অতি ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটি
বাবার মুখের কাছে নামিয়ে, বললেন, হেসে—
বিলক্ষণ! তোমাকে চিনবো না ?
তোমার ছবি যে আমি এঁকেছি!

তুমি, অবিনাশ! খুঁজে দেখো, আমার পেন্‌সিলে স্কেচ তোমার পোর্ট্রেট
আমার কাগজের মধ্যে আছে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—
ও তোমার ছেলে?
ওকে আমার গুহাটা দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো।
গুহাটা ওঁর গর্ব ছিলো
—পাহাড়ের উপরের দিকে—
তারো উপরে ওঁর লেখাপড়া শোবার ঘর—
সুন্দর বিস্তারিত দৃশ্য দূর প্রান্তরে মেলে দিতো।

সেজ-জ্যাঠাবাবু ওঁকে বলেন,
রাঁচীতেই আপনি থাকুন,
শরীর ভালো থাকবে।
রোজই তাই আসতেন—
নিজের লোক-টানা বাড়ির রিকশায় চেপে,
সার্কুলার রোডের বাড়িতে।
উপরে ছাউনি ঢাকা, রোদটা এড়িয়ে, হাঁটুর উপর কাগজপত্র রেখে,
রিকশায় বসেও লিখতেন,
—এই ছিলো তাঁর বেড়ানো—
সময়ের একান্ত সদ্ব্যবহার?
রাঁচীতে গেলেন, স্বাস্থ্যের কারণে,
কলকাতায় আর ফেরেননি॥

স্মরণীয় সেই দিনটি

হঠাৎ এক সন্ধ্যায়, ভাগ্নে শিশির আমাকে এসে জানালো
"রাঙাকাকাবাবু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। যাঁবে ?"
কুণ্ঠিত লজ্জিত দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করলুম—
"কবে, কখন ?"
তারিখ-সময় সঠিক জেনে এসেছিলো—
সুভাষবাবু তাঁর অবসর-সময় বলে দিয়েছিলেন,
গোছানো স্বভাব— ফাঁক রাখেননি।

আগেও তাঁর কাছে গিয়েছি কয়েকবার—
একবার 'চোরাবালি' পড়তে চেয়েছিলেন,
বইটি নিয়ে গিয়েছিলুম— সে তো অনেক বছরের কথা।
তারপরও গিয়েছি, মাঝে মাঝে, মনে পড়ে,
প্রায়ই ডাক পেয়ে।

সেবার যে-সময়ে বলেছিলেন— তাঁদের এলগিন রোডের
বাড়িতে গেলুম।
বাইরে পুলিশের কঠিন পাহারা—
কিন্তু আমার প্রবেশে বাধা হয়নি।

ভাগ্নেরাই কেউ বোধহয় আমাকে ওঁর ঘরে এগিয়ে দিলে।
দোতলার ঘরে সুভাষবাবু বিছানায় শুয়ে—
চোখ দুটি উজ্জ্বল, কিন্তু মুখে ক্লান্তির ছায়া— শরীর অসুস্থ, মনে হলো,
দাড়ি কামানো হয়নি ক'দিন।
শুয়ে বই পড়ছিলেন।
আমি ঘরে ঢুকতেই, বিছানায় উঠে ব'সে সাদর সম্ভাষণ জানালেন—
"আসুন ! রাস্তার দিকে দেখবেন—

দেখেছেন তো, চার-চারটে লোক, রাত্রিদিন পাহারা!
কী ভয়াবহ "চীজ" আমি, বলুন তো!
কোনো সময়ে রেহাই নেই, জানেন—
ভোর থেকে সারা দিনরাত— কোনো সময়ে বাদ নেই!"

তারপর নিজেই আবার বললেন, একটু থেমে— "বসুন!
আমি আপনাকে ডেকে পাঠালুম, ভাইপোকে দিয়ে—
আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।
আশা করি কোনো অসুবিধা নেই।"

আমি বসলুম, নীরবে—
তলব পেয়েই তো গিয়েছিলুম—
উনি ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে!

নিজেই বলতে লাগলেন—
"এই ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছে—
কারুর সঙ্গে দেখা করতে, অনুমতি চাই, তাঁদের!
বাড়ির লোকেদের সঙ্গেও— যেন নিয়মমাফিক কথাবার্তা
'হোম-ইন্‌টার্নড'— পুরো মাত্রায়— একেই বলে!"

আরো অনেক কথা— সে তো বহুদিন হ'ল আজ,
সব মনে নেই।
তিন-চার ঘণ্টার আপ্যায়িত— এল্‌গিন রোডের দোতলার ঘরে।
"আপনি কি দিন-ক্ষণ মানেন?
কোন্‌টা শুভ বা মঙ্গল, কোন্‌টা নয়।
মেজদা ওসব মানেন। আমি মানি না।
আপনি কি বলেন?"
আরো অনেক প্রশ্ন, নানা কথা, সাহিত্যিক—

বই সম্বন্ধে অনেক মতামত।
"আপনার আঁদ্রে মালরোর লেখা কেমন লাগে ?
অনেকের লেখা পড়েছি— অনেক প্রতিভাবানের লেখা—
কিন্তু অনেকের চেয়ে জ্ঞানী বিচক্ষণ
এই আটাশ-উনত্রিশ বয়সের ফরাসী লেখকটি।
দূরদৃষ্টি, সচেতন অনুভূতি, প্রখর বুদ্ধি—
ছোট বিষয় লক্ষ্য করার ক্ষমতাও প্রচুর—
আপনার কি তাই মনে হয় না ?"

বুঝলুম, অনেক কিছু পড়ছেন, গভীর চিন্তা করছেন।
কিন্তু কী, তা স্পষ্ট বুঝিনি, তখন।
পরে, আবার বললেন—
"আপনার কাছে ওঁর একটা বইয়ের ইংরিজি-অনুবাদটা আছে ?
নাম— 'কন্‌কোয়েস্ট'। আমাকে পড়তে দেবেন ?
আমি ঠিক এক মাস বাদে বইটি ফেরত দেবো,
ভাইপোদের কারুর হাত দিয়ে।"

আমি চ'লে আসার পর, শিশিরই বোধহয় আবার
বইটি নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে।

যেদিন বইটি ফেরত দেবার কথা—
ঠিক এক মাস পরে, সকালের খবরের কাগজে চমকপ্রদ খবর—
পরম শক্তিশালী ব্রিটিশ রাজের দিনরাত্রির পাহারা এড়িয়ে
সুভাষচন্দ্র বসু তাঁদের এল্‌গিন রোডের পৈতৃক ভবন হতে অন্তর্ধান !

মোহিনী চ্যাটার্জি

বাবার সঙ্গে বসে প্রায়ই গল্প করতুম।
একদিন সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে, একতলার ঘরে
কথা বলছি, গম্ভীর গলায় শুনতে পেলুম ডাক—
"অবিনাশ, বাড়ি আছো?"
বেরিয়ে দেখি, মোহিনী চ্যাটার্জি এসেছেন।
পরনে হাল্কা শাদা কোট আর দেশী ধুতি,—
দেখলুম শরীরটা খুব ভেঙেছে
চোখ দুটি অন্ধপ্রায়।
একজনের সাহায্যে ধীরে ধীরে আমাদের ঘরে ঢুকলেন—
নিজেরই ঘোড়াগাড়ি করে এসেছিলেন।

বাবার সঙ্গে খুব হৃদ্যতা ছিল, বহু বছরের—
দু'জনেই ছিলেন অ্যাটর্নী, স্বভাবের মিল ছিল।
যাতায়াত ছিল তাই।
বিকেলে আপিসের পর গঙ্গার ধারে বেড়ানও।

মোহিনীবাবু খুব সাত্ত্বিক লোক ছিলেন—
সাধুই বলা যায়।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পছন্দ করেন
আদি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য।
পরে, দ্বিজেন ঠাকুর তাঁকে জামাতা করেন।

আমার বাবা কখনও বিদেশ যাননি—
মোহিনীবাবু ছ'সাত বছর ইংলণ্ড-আয়ারলণ্ডে ছিলেন,-
তবু বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হতে দেননি।

সেদিন তাই মোহিনীবাবু বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন
কিছু কথাবার্তার পর বাবার মনে পড়ল
ইয়েট্‌সের লেখা, মোহিনীবাবুর বিষয়ে, কবিতা—
আমি বাবাকে পড়ে শুনিয়েছিলুম।
বাবা আমাকে বললেন—
মোহিনীবাবুকে কবিতাটি পড়ে শোনাও,
আমাকে যা শুনিয়েছিলে।

মোহিনীবাবুও বললেন— 'আমি চোখে দেখি না—
পড়ে শোনাও তো, আমাকে— কী লিখেছেন ইয়েট্‌স

কবিতাটি আমি পেয়েছিলুম একটি ম্যাগাজিনে—
অ্যামেরিকান সাপ্তাহিক— নিউ রিপাব্‌লিক।
সুধীনবাবুর চেনা হগ-মার্কেটে একটা বুকস্টলে
আমিও প্রায়ই বই দেখতে যেতুম,
ভালো বই পেলে কিনতুম।
ইয়েট্‌সের কবিতাটি বেরিয়েছে দেখে সংখ্যাটি কিনেছিলুম
বয়স আমার অল্পই তখন, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি—
নিজেরই অস্বস্তি হচ্ছে মোহিনীবাবুর কাছে পড়তে—
আমার উচ্চারণ ভালো নয়, সে তো আমি জানি।
তবু পড়ে শোনালুম কবিতাটি।

কবিতাটির শিরোনামাই— মোহিনী চ্যাটার্জি—
তারই চিন্তা ভাষা দিয়েছেন ইয়েট্‌স কবিতাটিতে—
এই মর্মে—

'উপাসনা করব আমি কিনা,
আমার এ-প্রশ্নের উত্তরে

ব্রাহ্মণ বললেন আমায় :
কোরো না কিছুই প্রার্থনা
বোলো প্রতি রাত্রে বিছানায়,
"আমি তো ছিলাম মহারাজ,
আমিই ছিলাম ক্রীতদাস,
দুনিয়ায় কিছু নেই আজ,
মূর্খ জুয়াচোর বা বদমাশ
আমি যা হইনি একবার,
অথচ আমার বক্ষ 'পরে
লক্ষ মাথা রেখেছে তো ভার।"
বালকের চণ্ড দিনরাত
যাতে হয় প্রশান্ত অন্যথা,
মোহিনী চ্যাটার্জি বললেন
ঐ বা অমনিতর কথা :'
কবিতাটির শেষ পংক্তিটি অনন্যসুন্দর, ইংরেজিতে
"মেন ডান্‌স অন ডেথলেস ফীট"—
বাংলা অনুবাদে বলা কি যায়
"মানুষের নৃত্য নিত্য মৃত্যুহীন পায়ে।"

মোহিনীবাবু খুব খুশী হলেন—
শেষ কথা ক'টি এখনও মনে গেঁথে আছে—
বললেন আমায়—
"দাও তো বইটি
আমার ছেলেকে দেবো—খুশী হবে সে।"
নিউ রিপাব্‌লিক ম্যাগাজিনটি
হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন॥

আমার চেনা গাছ ক'টি

তালগাছ দুটি— সারি সারি নারকেলের সামনে
আমাদের বাড়ির কাছে— ঠায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে,
সান-বাঁধানো ঘাটের ধারে— দুই প্রহরী খাড়া,—
প্রকাণ্ড দীঘির ধারে, ঐতিহাসিক মহীশূর-পরিবারের
প্রাচীন কবরখানার বাগানের এক প্রান্তে।

দীঘিটি অর্থগৃধ্ন লোকে দুর্গন্ধ পচা মাল দিয়ে
অর্ধেক ভরিয়েছে।
নিজেদের স্বার্থে, লোকালয়ের স্বাস্থ্যের কথা ভোলা সহজ।
ছিল একটি মহুয়া গাছ,
পাতা ঝরানোর পর কৌণিক ডালে
ফুলে বাতাস মাতিয়ে দিত সুগন্ধে।
কার জ্বালানীর প্রয়োজনে সে এখন নিশ্চিহ্ন।

ও-বছরেও দেখেছি— কদমগাছটি— রথের সময়ে পাড়া আলো
হাজার ফুলে— এ-বছরে দেখি সে সাফ্!
গাছের অনেক শত্রু—
সে-বছর কলকাতার সাইক্লোনে, সার-বাঁধানো জামরুল ক'টি
আমাদের বাড়ির পশ্চিমে— পালকের মতো উড়ে গেল হাওয়ায়-
কলকাতার ইঁট-লোহা-কংক্রিটে গাছের স্থান কোথায়?

এক কালীপূজায় ছেলেদের উড়নচণ্ডী হাউই
অসহায় একটি তালগাছের মাথা জ্বালিয়ে দেয়—
সে কী আগুনের দাউদাউ জিভ লকলকে!
হাওয়ায় স্ফুলিঙ্গ— হাল্কা ভেসে আসে
আমাদেরই শেষ প্রান্তের বাড়ির দিকে।

দমকল খবর পেয়ে গাড়ি নিয়ে এলো,
কিন্তু ঢুকবার রাস্তা কই ?
ওদিকে বিরাট প্যাণ্ডাল যে।
অনেক ঘুরে, মহীশূর-স্টেটের প্রাচীন মসোলিয়মের ভিন্ন ফটক—
দমকল টংটং শব্দে ঢুকতে সক্ষম।
তবে, সে-আগুন নেভানো ভার !
বহু পরিশ্রমে জল চূড়ায় পৌঁছে আগুন নেভায়
তবে পাড়া ঠাণ্ডা— যদিচ গাছটির মাথা পুড়ে কালো !
ভাবলুম— অচিরেই সে শুকিয়ে যাবে।

এক বছর নিঝুম মেরে সে দাঁড়িয়ে রইল—
পরের বছরই কচি-গোল পাতায় তার জয় সে জানালো !

আজ দেখি সে-গাছ— হাজারখানেক তালশাঁস—
হার-না-মানা হার পরেছে সে তার চূড়ায় !
রোজ কত পাড়ে— তবু যে অফুরন্ত।
চোখের আরাম— কচি সবুজ নিটোল কোমল শীতল সে-তালশাঁস !

—মরু বিজয়ের কেতন ওড়াও হে শূন্যে, ওড়াও, হে প্রবল প্রাণ !